প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি

- **ধর্ম :** একটা সময় ছিল যখন প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে 'হিন্দুযুগ' বলে অভিহিত করা হত । প্রাচীন ভারতে বৈদিক, ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দুধর্মই একমাত্র ধর্ম ছিল না । বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের জন্ম প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় জীবনকে জটিল করেছিল । কোনো সময় বৌদ্ধধর্ম, আবার কোনো সময় হিন্দু ধর্ম রাজানুগৃহীত হয়েছে । সাধারণভাবে ভারতের রাজা বা শাসক সম্প্রদায় সহিষ্ণু ও উদার ছিলেন এবং ইউরোপের মতো রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম— এই নীতি অনুসৃত না হলেও সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব ও সম্প্রীতি সবসময় অখুন্ন ছিল না । হিন্দুদের হাতে বহু বৌদ্ধ মঠ ও বিহার ধ্বংস হয়েছিল । 'বৃহদ্ধর্ম' পুরাণে বলা হয়েছিল— বৌদ্ধরা বলপূর্বক দাহিত হয়ে মরবে । সত্য সত্যই বৌদ্ধদের পুড়িয়ে মারা হয়েছিল কিনা, তার কোনো প্রমাণ অবশ্য নেই । পরে বুদ্ধকে বিষ্ণুর অন্যতম অবতার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল এবং বৌদ্ধদের হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল । শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ এবং জৈন উভয় ধর্মই তাদের প্রাধান্য ও গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল ।
- **(১) জৈনধর্ম মত ও পথের বিভাগ :** সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রত্যেক ধর্মেই মতভেদ দেখা দেয় এবং তা থেকে দুই বা ততোধিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে । খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষার্ধে দক্ষিণ বিহারে এক দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বহু জৈন ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে মহীশূর চলে যান । এদিকে পাটলিপুত্রে এক ধর্ম সম্মেলনে জৈন ধর্মের মূল সূত্রগুলিকে সংকলিত করা হয় । এই সংকলন দ্বাদশ অঙ্গ নামে পরিচিত । এরপর খ্রিস্টীয় পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতকে গুজরাটের বলভিতে আর একটি ধর্ম সভায় জৈন ধর্মগ্রন্থগুলি আবার সংকলিত হয় । ফলে দ্বাদশ অঙ্গ ছাড়া উপাঙ্গ, মূলসূত্র ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত হয় । ভদ্রবাহুর শিষ্যরা পরে উত্তর ভারতে ফিরে এসে এইসব অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলতেন এবং বস্ত্র পরিধান করতেন না । এঁদের বলা হত দিগম্বর । যারা এই নির্দেশ উপেক্ষা করে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করতেন, তাদের বলা হত শ্বেতাম্বর । এই ভাবে জৈনরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় । মূল আদর্শ নিয়ে উভয়ের মধ্যে তেমন তীব্র মতভেদ নেই ।
- **(২) বৌদ্ধধর্ম মত ও পথের বিভাগ :** কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় । পর পর কয়েকটি ধর্ম সম্মেলন আহ্বান করা হয় । রাজগৃহে বুদ্ধের দেহত্যাগের কিছু পরেই প্রথম ধর্ম সম্মেলন বসে । এর প্রায় ১০০ বছর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতি বসে । পাটলিপুত্রে তৃতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন স্বয়ং অশোক । কণিষ্কের সময় কাশ্মিরে চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতির আসর বসে । এই সম্মেলনে বৌদ্ধরা হীনযান এবং মহাযান— এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যান । গোঁড়া হীনযানরা মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করতেন না । অষ্টাঙ্গিক মার্গকেই তারা মুক্তির একমাত্র পথ বলে মনে করত । মহাযানরা মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করত এবং ব্যক্তির মুক্তির পরিবর্তে সমষ্টির মুক্তির উপর জোর দিত ।
- **(৩) হিন্দুধর্ম মত ও পথের বিভাগ :** হিন্দুধর্মেও মতভেদ পরিলক্ষিত হয় ও এই বিভাগ বা ধারা ছিল পাঁচটি— (১) বৈষ্ণব, (২) শৈব, (৩) শাক্ত, (৪) সৌর, (৫) গাণপত্য । গুপ্তযুগে এই পাঁচটি ধারা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিল । এইসব সম্প্রদায় বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান মেনে চললেও প্রত্যেকে ভক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল । অন্য দিকে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ উপাস্য দেবতার আরাধনা করলেও বাকিদের উপেক্ষা করতেন না । গুপ্তপরবর্তী যুগে হিন্দু দেব-দেবীর মধ্যেও যেন এক ধরণের বর্ণ ভেদ দেখা দেয় । কোনো কোনো দেব-দেবীর স্থান হয় উঁচুতে, কারোও বা নিচে । যেমন— বিষ্ণু, শিব, এবং দূর্গা ছিলেন প্রধান দেব-দেবী । অন্যান্যদের স্থান ছিল নিচে তাঁদের অনুচর হিসাবে । শিল্প ও সাহিত্যেও এর প্রতিফলন ঘটেছিল । একই ভাবে সেবাইতরাও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল । সবার উপরে ছিলেন আচার্য্য । একজন রাজপুত্রের মতো তাঁরও অভিষেক হত । খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে হিন্দু ধর্মে তান্ত্রিকদের উদ্ভব ঘটেছিল । তান্ত্রিকদের মধ্যে নারী ও শূদ্রদেরও ঠাঁই হয়েছিল । উপজাতিদের হিন্দু ধর্ম ও সমাজে গ্রহণ করবার ফলে তান্ত্রিক মতবাদের উদ্ভব ঘটেছিল । বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেও তান্ত্রিক মতবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল
- ভারতের ভাষা, ধর্মবিশ্বাস, নৃত্যকলা, সংগীত, স্থাপত্যশৈলী, খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক-পরিচ্ছদে অঞ্চলভেদে ব্যাপক বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসবের মধ্যে একটি সাধারণ একাত্মতা পরিলক্ষিত হয়। ভারতের সংস্কৃতি কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন এসব বৈচিত্র্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও রীতিনীতির একটি সম্মিলিত রূপ।
- ভারতীয় সভ্যতা প্রায় আট হাজার বছরের পুরনো। এই সভ্যতার একটি আড়াই হাজার বছরের লিখিত ইতিহাসও রয়েছে। এ কারণে কোনো কোনো ঐতিহাসিক এই সভ্যতাটিকে 'বিশ্বের প্রাচীনতম জীবন্ত সভ্যতা' মনে করেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ধর্ম, যোগ ও ভারতীয়দের খাদ্যপ্রীতি আধুনিক বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। সভ্যতার এই উপাদানগুলো সমগ্র বিশ্বে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।
- ভারত হলো হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ও শিখধর্মের উৎপত্তিস্থল। ইতিহাসবিদরা বলেছেন, এই চারটি ধর্ম একত্রে ভারতীয় ধর্ম নামে পরিচিত। ভারতীয় ধর্মগুলো আদি ধর্মগুলোর মতোই বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান ধর্মীয় যূথ। বর্তমানে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম যথাক্রমে বিশ্বের তৃতীয় ও চতুর্থ বৃহত্তম ধর্মবিশ্বাস। এই দুই ধর্মের অনুগামীর সংখ্যা ২ বিলিয়নেরও বেশি। (সম্ভবত ২.৫ বা ২.৬ বিলিয়ন)। লিঙ্গায়েত ও আহমদিয়া ধর্মমতের উৎপত্তিস্থানও ভারত।

- ভারতের জনসাধারণের মধ্যে যে ধর্মকেন্দ্রিক পার্থক্য ও মিল রয়েছে, তা বিশ্বের আর কোনো দেশে দেখা যায় না। এই দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর মানুষের ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রায় ধর্মই কেন্দ্রীয় ও প্রধান ভূমিকা পালন করে। ভারতে সামাজিক অন্য আচার অনুষ্ঠানও ধর্মকে কেন্দ্র করেই বিকাশ লাভ করেছে। আর ধর্মই হচ্ছে ভারতে সবচেয়ে স্পর্শকাতর। বহুধর্মের মানুষের ধর্মচর্চা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্যই দেশটির সংবিধান সেক্যুলার, যা বিশ্বের বহু দেশের কাছে অনুসরণীয়।
- ভারতের ৮০ শতাংশ মানুষ হিন্দুধর্মের অনুগামী। ১৩ শতাংশ মানুষের ধর্ম ইসলাম। তা সত্ত্বেও শিখধর্ম, জৈনধর্ম ও বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব শুধু ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বে প্রতীয়মান। খ্রিস্টধর্ম, জরথুস্ত্রবাদ, ইহুদি ধর্ম ও বাহাই ধর্মের কিছু প্রভাব ভারতের সংস্কৃতিতে থাকলেও, এই ধর্মগুলোর অনুগামীর সংখ্যা অনেক বেশি নয়। ধর্ম ভারতীয়দের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরধর্মসহিষ্ণুতাও সাধারণ ভারতীয়দের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ভারতের মতো বহুধর্মের অস্তিত্বসম্পন্ন দ্বিতীয় দেশটি পৃথিবীতে আর নেই।
- সংস্কৃতিবিশেষজ্ঞ ইউজিন এম মাকারের মতে, ভারতের প্রথাগত সংস্কৃতির ভিত্তি আপেক্ষিকভাবে কঠোর এক সামাজিক ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাস। তিনি আরো বলেছেন, শিশুদের অতি অল্পবয়স থেকেই তাদের সামাজিক কর্তব্য ও অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হয়। ভাতীয়দের অনেকেই অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী। তারা চেতনার গভীর থেকে বিশ্বাস করেন, মানুষের জীবনকে চালনা করেন দেবতা ও উপদেবতারা। বর্ণাশ্রম প্রথা দেশের একটি শক্তিশালী সামাজিক বিভাজন রেখা। সহস্রাধিক বছর ধরে উচ্চবর্ণের মানুষরা সামাজিক বিধিনিষেধগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন। তবে সাম্প্রতিককালে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে, এই বিভাজন অনেকটাই নির্মূল হয়েছে। গোত্রব্যবস্থা হিন্দুদের পারিবারিক জীবনের একটি বিশিষ্টতা। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবারগুলোর সঙ্গে তাদের পূর্বপুরুষদের সম্পর্ক রক্ষিত হয়ে থাকে। গ্রামাঞ্চলে, এমনকি কখনো কখনো শহরাঞ্চলেও একই পরিবারের তিন কিংবা চারটি প্রজন্মকে একই ছাদের তলায় বসবাস করতে দেখা যায়। পুরুষতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পারিবারিক সমস্যাগুলোর সমাধান করা হয়ে থাকে।
- ভারতের সংস্কৃতিতে পরিবারের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এ দেশে একান্নবর্তী পরিবারের প্রথা চলে আসছে। এ ব্যবস্থায় বাবা-মা, ছেলে-পুত্রবধূ ও তাদের সন্তান-সন্ততি প্রভৃতি একসঙ্গে বসবাস করে। সাধারণত বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ সদস্যই একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা হন। তিনিই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেন এবং নিয়মকানুন স্থির করে দেন। পরিবারের অন্য সবাই তাকে মান্য করে চলে। তবে এখন শহরের পরিবারগুলোতে একক পরিবারের প্রচলন হচ্ছে ব্যাপকভাবে।
- পূর্বপরিকল্পিত বিয়ে বা সম্বন্ধ করে বিয়ে ভারতের একটি শতাব্দীপ্রাচীন প্রথা। আজও ভারতীয়দের অধিকাংশের বিয়ে হয় বাবা-মা ও পরিবারের অন্য সম্মানীয় সদস্যদের পরিকল্পনা এবং বর ও বধূর সম্মতিক্রমে। পণপ্রথা থাকলেও, ভারত সরকার তা বেআইনি ঘোষণা করেছে। তবে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে এই প্রথা রয়েই গেছে। সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে পণ দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারটি গোপন রাখা হয়ে থাকে। সম্বন্ধ করে বিয়েতে বয়স, উচ্চতা, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও রুচি, পারিবারিক প্রেক্ষাপট (অর্থবল ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা), বর্ণ ও ঠিকুজি-কোষ্ঠী বিচার করে পাত্রপাত্রী নির্বাচন করা হয়।
- ভারতীয় সংস্কারে বিয়ে হলো সারা জীবনের সম্পর্ক। ভারতে বিয়েবিচ্ছেদের হার অত্যন্ত কম (মাত্র ১.১%, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই হার ৫০ শতাংশ)। সম্বন্ধ করে বিয়েতে বিয়েবিচ্ছেদের হার আরো কম। তবে সাম্প্রতিককালে বিয়েবিচ্ছেদের হার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাচীনপন্থিরা বিয়েবিচ্ছেদকে সামাজিক রীতি লঙ্ঘন মনে করলেও, আধুনিকতাবাদীরা নারীর অধিকার রক্ষায় এটিকে জরুরি মনে করেন।

• প্রাচীন ভারতের শিল্প ও চিত্রকলা :

- **(১) মৌর্য যুগ :** মৌর্যযুগে অশোকের সময় থেকে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় । অশোকের নির্মিত স্তম্ভগুলি, বিশেষত সারনাথের স্তম্ভ উন্নত শিল্পশৈলী ও কারিগরি বিদ্যার নিদর্শন । মৌর্য যুগে স্থাপত্যের নিদর্শন অবশ্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয় । অশোক সারা ভারতে স্তম্ভ ও প্রায় ৮৪,০০০টি মন্ডপ নির্মাণ করেছিলেন । এই মন্ডপগুলির মধ্যে সচেয়ে উল্লেখ যোগ্য হল **সাঁচি স্তুপ** ।
- (২) **মৌর্যোত্তর যুগ :** মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের শুরু পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় শিল্পরীতিতে কয়েকটি বিশেষ ধারার উদ্ভব ঘটেছিল । এর মধ্য উত্তর ভারতে **ভারহুত, বুদ্ধগয়া, মথুরা** ও **গান্ধার** শিল্পরীতি এবং দক্ষিণ ভারতে **অমরাবতী** ও **নাগার্জুনিকোন্ড** শিল্পরীতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এগুলির মধ্য তক্ষশিলা, আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে গড়ে ওঠা **গান্ধার শিল্প** শিল্পরসিক ও সমালোচকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । গান্ধার শিল্পের নিদর্শন হিসাবে যে সব বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে, তাদের দৈহিক গঠন একেবারে নিখুত । এখানে গ্রিক-রোমান শিল্পরীতির প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তার আদর্শ ও সত্তা ছিল পুরোপুরি ভারতীয় । এইজন্য গান্ধার শিল্প সম্পর্কে বলা হয় যে, শিল্পীর হাত ছিল গ্রিকের, কিন্তু হৃদয় ছিল ভারতীয় । অন্যদিকে মথুরায় যে শিল্পরীতি গড়ে উঠেছিল, তা সম্পূর্ণরূপে বিদেশি প্রভাব মুক্ত । এই সময় কালেও ভাস্কর্যের নিদর্শনের পাশে স্থাপত্যের নিদর্শন অনেকাংশে ম্লান । এই সময়ে নির্মিত গুহা ও চৈত্যগুলি আকর্ষনীয় । নাসিক, কার্লে প্রভৃতির চৈত্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ।
- (৩) **গুপ্তযুগে শিল্পকলা :** স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ইতিহাসে গুপ্তযুগকে **স্বর্ণযুগ** বলে আখ্যা দেওয়া হয় । **অজন্তা** ও **ইলোরা** -র গুহা-মন্দিরগুলির নির্মাণশৈলীর মধ্যে গুপ্ত স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় ।

- এই সময়কার অনেক মন্দিরই ধ্বংস হয়ে গেছে । সাঁচি ও দেওঘরে পাথরের তৈরি মন্দিরগুলি আকারে ছোটো । কিন্তু সৌন্দর্য ও নির্মাণশৈলীর বিচারে অসাধারণ । ভিতরগাঁও –এর ইটের তৈরি মন্দিরটি আকারে বড় । এই মন্দিরটিও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে । হিন্দু ও বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণে গুপ্ত ভাস্কর্যের পরিচয় পাওয়া যায় । বহু বৌদ্ধমূর্তি সারনাথ থেকে পাওয়া গেছে । মথুরা ও অন্যান্য অঞ্চল থেকেও পাথর এবং ব্রোঞ্জের বহু বুদ্ধ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে । শিব, বিষ্ণু এবং অন্যান্য হিন্দু দেবতার মূর্তি দেওঘর মন্দিরের গায়ে খোদিত অবস্থায় পাওয়া গেছে । অজন্তার গুহা চিত্রগুলি গুপ্ত চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । অজন্তার গুহা চিত্রগুলির মধ্যে গৌতম বুদ্ধের জীবনের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে । বাঘ গুহার চিত্রগুলিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে ।
- চূড়া ও শিখরের আকৃতির বিচারে গুপ্ত যুগের পর থেকে প্রাচীন যুগের শেষ পর্যন্ত সময়ের শিল্পরীতিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে— (ক) ইন্দো-এরিয়ান বা উত্তর ভারতীয় শিল্পরীতি এবং (খ) দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড়ীয় শিল্পরীতি ।
- **(ক) ইন্দো-এরিয়ান বা উত্তর ভারতীয় শিল্পরীতি :** উত্তর ভারতীয় শিল্পরীতির নিদর্শন হল ভুবনেশ্বর, পুরী, খাজুরাহো, দিলওয়াড়া, মার্তন্ড, কোনারক, ইত্যাদি ।
- **(খ) দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড়ীয় শিল্পরীতি :**
- **(১) পল্লব শিল্প :** দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলার শিল্পরীতিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে পল্লব শিল্পে অলংকারের প্রাচুর্য নেই । কিন্তু সূক্ষ শিল্পের কাজে ও সৌন্দর্যের বিচারে পল্লব শিল্প অতুলনীয় । মূলত ধর্মীয় বিষয়ের ওপর গড়ে ওঠা পল্লব শিল্পকে চার ভাগে ভাগ করা যায় ।
- (ক) **মহেন্দ্র শিল্পরীতি :** যেগুলি পাহাড় কেটে গুহা-মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে ।
- (খ) **মামল্ল শিল্পরীতি :** যেগুলি পাহাড় কেটে রথাকৃতি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে ।
- (গ) **রাজসিংহ শিল্পরীতি :** যেগুলি পাথরের স্বতন্ত্র মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে ।
- (ঘ) **নন্দীবর্মন শিল্পরীতি :** নন্দীবর্মন গোষ্ঠীর শিল্পরীতির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল মুক্তেশ্বর ও মাতঙ্গেশ্বর মন্দির ।
- **মহাবলী পুরম** বা **মামল্লপুরমের রথগুলি** পল্লব শিল্পের অন্তর্গত মামল্ল শিল্পরীতির সবচেয়ে বড় উদাহরণ । **একাম্বরনাথ** মন্দির **অনন্তশয়ন** মন্দির মহেন্দ্র শিল্পরীতির স্বাক্ষর বহন করে । এইসব রথে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপূর্ব মিলন ঘটেছে ।
- **(২) চোল শিল্পরীতি :** দ্রাবিড় শিল্পরীতির চরমতম বিকাশ ঘটেছিল চোল আমলে । কাঞ্চিপুরমের **কৈলাসমন্দির, গঙ্গৈকোন্ড-চোলপুরমের মন্দির** এবং তাঞ্জোরের **বৃহদেশ্বর মন্দির** হল চোল শিল্পের প্রধান নিদর্শন । পাথরের তৈরি স্বাধীন মন্দির যেগুলি পাহাড় কেটে তৈরি নয়, বৃহৎ তোরণ, মন্দির গাত্রে খোদাই করা অসংখ্য মূর্তি হল চোল শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য ।
- **(৩) চালুক্য শিল্পরীতি :** দক্ষিণ ভারতে '**চালুক্য রীতি**' নামে আর একটি শিল্পরীতি প্রচলিত ছিল । চালুক্য যুগে হিন্দু মন্দিরগুলি অনেক সময় জৈন মন্দির ও বৌদ্ধ মঠের অনুকরণে তৈরি হত । চালুক্য রীতির উদাহরণ হল বাতাপির **বিষ্ণুমন্দির,** আইহোলের **বিষ্ণুমন্দির,** পট্টৎকলের **পাপনাথ** ও **বিরূপাক্ষ মন্দির,** বোম্বাইয়ের **এলিফ্যান্টা মন্দির** । রাষ্ট্রকুট আমলে চালুক্য রীতির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল । ইলোরার বিখ্যাত **কৈলাস মন্দির** রাষ্ট্রকুট শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ।